তাসের দেশ: দাসত্বের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ

আবদুর রউফ চৌধুরী

তাসের দেশ– এ-দ্বীপের সকলই তাসবংশীয়, বাস্তব জ্ঞানালোর বাইরে, বহুদুরের এক বাসিন্দা। বাইরের জ্ঞান, আলো, বাতাস বা মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ; বাহির্জগতের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বিহর্সমাজের জ্ঞানালো যাতে সমাজে প্রবেশ করতে না-পারে এর জন্য সদা সচেতন। সযত্নে করে সমাজের ভেতর কুংস্কার রক্ষিত। অধিবাসীরা স্বতন্ত্র, আকৃতি বা প্রকৃতি কিছুই মানুষের সঙ্গে মিলে না। গতিহীন ও চাঞ্চল্যবিহীন জীবন। আচার-আচরণও অদ্ভুত– যুক্তিহীন, বুদ্ধিহীন, প্রগতিহীন আচার-অনুষ্ঠানে ভরপুর। নিয়মের কোনোরকম শীতলতা নেই। ঘটলে সকলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। শাস্ত্রের বিধি ও প্রথা অনুযায়ী নিয়মনীতিপদ্ধতি চালিত। পরিবেশ, জীবনযাত্রা, চিন্তাচেতনা মন্ত্রতন্ত্রে গ্রন্থিত। বংশমর্যাদা ও শ্রেণীবিন্যাসের কোনো গড়মিল ঘটে না; এক বর্ণের সঙ্গে আরেক বর্ণ 'এক পংক্তি'তে বসে না।

১৯৩৩ সালে 'তাসের দেশ' নাটক হিসাবে রচিত হয়, আষাঢ় ১২৯৯ সালের 'সাধনা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত 'একটি আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বন করে; রূপকথার আবহ বজায় রেখে গান, নাচ, সংলাপ ও দৃশ্যযোজনে 'তাসের দেশ'-এর সৃষ্টি। মুলভাবের দিকে 'অচলায়তন'-এর সঙ্গে এর একটা সাদৃশ্য আছে। ১৩৪০ সালে 'চন্ডালিকা'র সঙ্গে 'তাসের দেশ' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন সুভাষচন্দ্র বসুকে। তিনি লিখেছিলেন,

> কল্যাণীয় শ্রীমান সুভাষচন্দ্র,
> স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ ক'রে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।
> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১]

এ-থেকে সুস্পষ্ট যে, নাটকের মুল বক্তব্য কী? গতানুগতিকতা, পুরাতন নিয়মানুবর্তিতা, পরিবর্তনহীনতা নিগড়ে বাঁধা যে-সমাজ তার জীবন্মৃত অবস্থা 'তাসের দেশ'-এ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। 'তাসের দেশ' শুধু পুরাতনের নূতন রূপ নয়; গান-কথা-রস-ভাষা-আইন-রাষ্ট্র তত্ত্বেও ভরপুর বটে। এ-সম্বন্ধে অশোক সেন বলেছে,

> এখানে রূপান্তর শুধু নয়, যেন জন্মান্তর ঘটেছে। নবরূপে শুধু নির্জীবতা নিন্দিত এবং প্রাণ বন্দিত হয়নি, [...] এখানে প্রসঙ্গত বংশমর্যাদা, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, সংস্কার নিয়ম, শাস্ত্রমতে জাতির উৎপত্তি বিবরণ, খবরের কাগজে ভাষা, রাষ্ট্রের বাধ্যতামুলক আইন ইত্যাদিকে বিদ্রূপ করা হয়েছে।[২]

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> শুষ্ক নিয়মানুবর্তিতা সর্বনাশেরই পথে লইয়া যায় এবং মানুষকে মৃতকল্প করিয়া ছাড়ে। এ যেন আমাদেরই সনাতনপন্থী নির্জীব অলস বিশেষত্বহীন পরিবর্তন-পরাঙ্মুখ ভারতবর্ষকেই কবি 'তাসের দেশ'-এর ভিতর দিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন।[৩]

'তাসের দেশ'এর শাস্ত্রবিধি ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ প্রকাশ করে, সমাজের তথাকথিত শৃঙ্খলার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, সে হচ্ছে রাজপুত্র, নাটকের প্রধান চরিত্র। সে তরুণ, চাঞ্চল, বিজ্ঞানের চেতনায় আলোকিত। সে যৌবনের দুত, নিত্য-নৈমিত্তিক 'এক ঘেয়ে' জীবনে হাঁফিয়ে ওঠাই তার সভাব। রাজবাড়ির দিনগুলোর গতানুগতিকতায় সে বিষন্ন ও উদাসীন, এখানে নিয়ম মতো চলতে হয়; তাই তার ভোগে রুচি নেই; সে যেন 'সোনার মন্দিরে পাথরের দেবতা', দিনরাত শুধু শঙ্খ আর কাঁসার ধ্বনি ছাড়া অন্যকিছু কানে পৌঁছে না। এমনকি রাজপুত্র যখন শিকারে যায় তখন বাঘগুলোকে রাজশিকারী আফিম খাইয়ে রাখে, এরকম পরিহাস তার আর সহ্য হয় না। সে চায় অসত্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যের সন্ধান করতে। মনের মধ্যে প্রতিবাদ জমে ওঠে। এ প্রতিবাদ প্রকাশ করতেই বোধহয় একদিন, বন্ধু সদাগরপুত্রের নিয়মমাফিক কাজের আহ্বানে, সে বলে 'নিরাপদের খাঁচায় থেকে থেকে আমাদের ডানা আড়ষ্ট হয়ে গেল।

---

[১] চন্ডালিকা।
[২] রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা, ১৯৫৮।
[৩] একটি আষাঢ়ে গল্প, গল্পগুচ্ছ।

আগাগোড়া সবই অভিনয়। আমাকে যুবরাজী সঙ বানিয়েছে। আমার এই রাজসাজ ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে।'[৪] রাজপুত্র যেতে চায় বাণিজ্যে, নূতনের সন্ধানে, নিরুদ্দেশে; ছেড়ে যেতে চায় লক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর সন্ধানে; লক্ষ্মীই তো ভীরু করে, আর অলক্ষ্মীই তো ঘরছাড়া করে– বিপদ না-থাকলে ভরসা যে থাকে না। রাজপুত্র চায় কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে যেতে, নিরুদ্দেশের পথে, নূতন দেশের অন্বেষণে, নবীনার সন্ধানে। রাজপুত্র শ্বেতচন্দনের তিলক, শ্বেতকরবীর গুচ্ছ পরে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুহৃদ-বন্ধুকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ে চিরনবীনার উদ্দেশ্যে। সাগরজলে তরী ভাসিয়ে উদ্বেলিত চিত্তে দু-বন্ধু রওয়ানা দেয় চির-অজানার পথে। কূলে পৌঁছতে না-পারলেও তাদের মনে কোনো শঙ্কা নেই, দ্বিধা নেই। তারা সমুদ্রের তলদেশ আবিষ্কার করতে সক্ষম; তারা যে 'নতুন যৌবনের দূত'। এরই মধ্যে প্রচ ঝড় ওঠে, তরী যায় ভেঙে, ঝোড়ো হাওয়ার উপহার স্বরূপ ভাঙাতরীটাকে ভাসিয়ে কূলে এসে ভিরায়; নতুন দেশ, আজব দ্বীপ, 'তাসের দেশ'; এ নতুনও না পুরাতনও না। সদাগরপুত্রের চোখে মনে হয় 'যেন ছুতোরের তৈরি কাঠের কুঞ্জবন।' লোকগুলো 'বেঁচেও নেই মরেও নেই'; কাগজের তৈরি, বুক-পিঠ এক, চেপটা, পা ফেলে 'খিট্‌খুট্‌' শব্দে, 'চৌকো-চৌকো কেঠো চালে' নড়েচড়ে, শোয়বসে একবারে অকারণে; উঠাবসা, চলাফেরা, নড়াচড়া সবই নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা। ওদের অস্তিত্বটাকে না-বলে ঘুম, না-বলে সজাগ। ওরা কথা বলে, কাব্যের কথা থেকে শুধু ছন্দটা বের করে আনে, কিন্তু অর্থের বালাই নেই; কাজ করে উদ্দেশ্যেহীন। হাসতে জানে না, হাসির নিয়ম অজানা; কান্না নেই, সন্দেহ নেই, দ্বিধা নেই। স্বকীয় নিয়মের শিকলে বাঁধা পড়া ওদের জীবন; চাল আছে কিন্তু চলন নেই; চলে বটে কিন্তু এগোয় না– একটা নিয়মের বন্ধনে যেন অবদ্ধ। নানা প্রথাসংস্কার ঘিরে রেখেছে। প্রথা ও আচারাচরণের দাস যেন। নির্বিবাদে ওরা শৃঙ্খলার সঙ্গে এ-নিয়ম মেনে চলে। এ-নিয়মের উদ্দেশ্যের কারণটা বোঝার মতো ব্যক্তিত্ব, সজীবতা এদের মধ্যে নেই। যন্ত্রের মতোই ওরা; প্রাণহীন, নির্জীব। ওদের জাত-কুল-গোত্র-জ্ঞাত-গোষ্ঠী-শ্রেণীপংক্তি আছে। প্রচীনকাল থেকে সমাজে ওদের পদমর্যাদার ছকবাঁধা আছে। ওরা এর পরিবর্তন করার প্রয়োজন বোধ করে না। এ জাতির উদ্ভব হয়েছে ব্রহ্মার 'হাই' থেকে। চতুর্বর্ণে বিভক্ত, সনাতনপন্থী। সমাজে কার কী মূল্য ও কোথায় কার পরে কার স্থান তা স্থির করা আছে। এ-নিয়মের ঔচিত্য, অনৌচিত্যের মূল্য নিয়ে বিচারবিবেচনা করতে কেউ সাহস পায় না। বর্ণাশ্রমধর্ম এখানে কায়েমী। গায়ে ফোঁটা কেটে সবাইকে মূল্য তথা মান নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। দুরির চেয়ে তিরি বড়, তিরির চেয়ে চৌকো, তারপর পঞ্জা, ছক্কা— ক্রমে দহলা পর্যন্ত। তার উপর গোলাম, সাহেব, টেক্কা। 'সাড়ে সাঁইত্রিশ' রকম জাত নিয়ে অভ্যস্ত জীবনে বাঁধানিয়মের তালে তালে পা ফেলে তাসবাসীরা বেশ আরামেই ছিল। এরকম নিয়মের রাজত্বে হঠাৎ 'তাসের দেশ'-এ উপস্থিত হয় অলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যের যাত্রীরা, ঘরের বাঁধন ছেড়ে অনিশ্চিয়তার দিকে যারা ধাবিত হয়েছে, যারা চায় সবকিছু উল্টোপাল্টো করে দিতে, ঢাকাপরা দেশের ঢাকনা খোলে দিতে। তারা জানে ঢাকনা খোলে দিলেই 'ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ'টা বেরিয়ে আসবে; কিন্তু ওরা তাসের দেশের 'বিদেশী'। বিদেশীর দিকে তাসবাসীদের দৃষ্টিপাত হলেই তারা অশুচি হয়। কোনো কারণে যদি তাসবাসীর দৃষ্টি পড়ে যায় বিদেশীর উপর তাহলে তাদেরকে 'বাদুড়ে-খাওয়া গাবের আঁঠি পুড়িয়ে তিনদিন চোখে কাজল' পরতে হয়; তবেই উদ্ধার, 'স্বর্গে পিতামহদের উপোস ভাঙবে।'

'তাসের দেশ'এর রাজা নূতনদের উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্যে ভরা মন্তব্য করেন, 'বিদেশী'! ওরা সেই বিদেশী, যারা বাঁধনবান্ধন ভেঙে সমস্ত কিছু নিজের মতো যাচাই করে দেখতে চায়, অকূলের উদ্দেশ্যে তরী ভাসিয়ে বিশ্বপরিভ্রমণ করে বিচার করতে চায়। বিদেশীর আবির্ভাবে তাসবাসীরা চমকে ওঠে, সমাজে ঝড় ওঠে, হালকা হাওয়াতেই প্রথম ঝড় সৃষ্টি হয়; কিন্তু এতেই মান্ধাতার আমলের নিয়মের তাল যায় কেটে, যুগযুগ সঞ্চিত সংস্কারের আবর্জনাকে উড়াতে থাকে নিময়ভাঙার উন্মাদনায়। শুরু হয় ধরাবাঁধা জীবনে চাঞ্চল্যতা, ছন্দপতনতা, আস্তে আস্তে বিপ্লব, জাগরণ। তাসবাসীদের মনে জেগে ওঠে ইচ্ছা, মুক্তির তৃষ্ণা, সনাতন নিয়ম ভাঙার উন্মাদনা। ক্রমে তাসবাসীরা বুঝতে শিখে— এ-দ্বীপের মধ্যে থমকে থাকা যে ঘোলাটে জীবন তার বাইরে

[৪] তাসের দেশ।

প্রবাহিত হচ্ছে আরেকটা জীবনধারা, মুক্তির জয়গান; কিন্তু সম্পাদক শোনতে পায় এরই মাঝে সর্বনাশের বাঁশি; তাই 'তাসের দেশ'এর কৃষ্টি রক্ষা করার জন্য সে পদক্ষেপ নেয়। বলে, 'বাধ্যতামুলক আইন চাই।' এ আবার কী! 'কানমলা আইনের নব্য ভাষা।' 'তাসের দেশ'এর নবতম অবদান। অবশেষে গতানুগতিক জীবনযাত্রা নেহাতই অদ্ভুত বলে তাসবাসীদের কাছে উদয় হতে শুরু করে। শুরু হয় নিময়ভাঙার আন্দোলন। স্বাভাবিক জীবনের ধাক্কায় তাদের জীবনচক্রে অরাজকতা দেখা দেয়। দেশের সকলেই আইন-অমান্য করতে শুরু করে। তারা চালায় 'অবাধ্যতামুলক বে-আইন'। তারা আর বসে থাকতে পারে না। কেউ গান করে, কেউ ফুল তুলে, কেউ লাল ফিতে দিয়ে চুল বাঁধে, কেউ অকারণে হেসে ওঠে। এমনকি উর্মিলা নদীটাও মুক্ত মনে বয়ে চলে আপন তালে। পাখীরা গান গায় নিকুঞ্জকাননে। সখীরা শুনে তাদের মাঝে প্রেমের প্রলোভন। সবদিকে জেগে ওঠে, 'ইচ্ছে!' চারদিকে নিয়ম ভাঙার ডাক যেন। বিদেশীরা এদেশে নিয়ে আসে মুক্তির গান; অশান্তির চঞ্চলতা, নিয়মের অবাধ্যতা। এ-বিদেশীদের প্রাণচঞ্চল হাওয়ায় দেশের সংস্কার, যা ছিলো ঘুণে ধারা, ভেঙে যায়। তাসের বিরাট সৌধ হয় ধূলিসাৎ। বিদেশীর যৌবনচঞ্চল ছোঁয়ায় এ জীবন্মৃতদ্বীপে আসে জাগরণ, নূতন আলোড়ন। এতদিন যারা ছিলো প্রাণহীন আজ তারা হয়ে ওঠে নূতন স্পন্দনে, স্বাধীন ইচ্ছার প্রাণশক্তিতে, আপ্লুত। সকল কুসংস্কার, জড়তা, নিয়মতান্ত্রিকতা ছিন্ন হয়ে যায়। বাঁধ ভেঙে যায় জীবনচেতনায়। শুকনো নদীতে আসে জীবনের 'উদ্দাম কৌতুক'।

'তাসের দেশ' নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-কথাটা প্রকাশ করেছেন তা হচ্ছে—প্রাণহীন, অর্থহীন, কুসংস্কারযুক্ত নিয়মনীতির আওতায় পরিচালিত কোনোরকম সমাজব্যবস্থাই চিরকাল চলতে পারে না। পুরাতনকে ভেঙে নূতনের সৃষ্টির আদর্শই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যশিল্পের উদ্দেশ্য। তিনি চেয়েছেন মানুষের আত্মার মুক্তি; এ চিন্তারই রূপ নিয়েছে 'তাসের দেশ'এ, গভীর জীবনবোধ, অসাধারণত্বের স্বাক্ষর। সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈদিক জীবনের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষকে সচেতন হতে হয়; কারণ মানুষের বোধ, তার চিন্তা, তার আচারাচরণ কোনো বিশ্বাত্মার ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় না, এগুলো বাস্তবজীবন থেকে প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়। সক্রিয় জীবনপন্থাই সচেতন মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। 'তাসের দেশ'এ রবীন্দ্রনাথ শুধু মানুষের মুক্তির কথা বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল ঐকান্তিক, অভ্রান্ত, সক্রিয় ও আন্তরিক। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনসংগ্রামই শিল্পসাহিত্যে প্রতিফলিত হোক এবং সে শিল্পসাহিত্যই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুক্তিলাভের পথ উন্মুক্ত করে দিক- এ ছিল ববীন্দ্রনাথের অভীষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন দুঃসাহসিক, তেমনি অভিনব। জীবনবোধের গভীরতা ও ব্যাপকতা থেকেই এর জন্ম। এবং এ বোধ অনেক পরিমাণে বাস্তবজীবনদর্শনের খুবই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মানুষ, জীবন ও শিল্প অভিন্ন। তিনি যেমনি নিজের জীবনকে ভেঙে ভেঙে নূতনভাবে গড়ে এক অনুপম শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে শিল্পসাধনার মাধ্যমে নূতন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তাই জীবন ও শিল্প তাঁর কাছে অভিন্নার্থক। অহিংসা, শান্তি ও মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র ও প্রেমসম্পর্কের আর্দশ ঘোষিত হয়েছে তাঁর শিল্পসাধনার বাণীতে। তাই তো তিনি বলেছেন যে, যৌবনের আনন্দে ভয়হীন সজীবনবীন তরুণরা নূতনের আহ্বানে জীর্ণপুরাতনকে ভেঙে দেবে। এ 'তাসের দেশ' হচ্ছে সনাতনপন্থী বাংলাদেশ। কতবার কত রাজামহারাজার আবির্ভাব ঘটেছে এদেশে। তারা বাঙালির কানে কানে বলে গেছেন, ভাঙতে হবে এখানকার সব অলসতার বেড়া, ভাঙতে হবে নির্জীবের গন্ডি, রাজাকারের আস্তানা, ঠেলে ফেলতে হবে এসব নিরর্থক আবর্জনা, ছিঁড়ে ফেলেতে হবে কুসংস্কারের আবরণ টুকরো টুকরো করে। হে তরুণ মুক্ত করো, শুদ্ধ করো, পূর্ণ করো বাংলাদেশ।